বাংলাদেশী মানুষজনের সম্পর্কে রোহিঙ্গাদের ধ্যানধারণা
*বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়*

**রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মতামত -** প্রত্যাবাসন, স্বাস্থ্য, রমজান, মাঝি এবং চরম আবহাওয়া
*বিস্তারিত চতুর্থ পৃষ্ঠায়*

মৎস্য-শিকারে নিষেধাজ্ঞা, জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক সংকট
*বিস্তারিত ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়*

# যা জানা জরুরি

মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন
ইস্যু ৫ × সোমবার, ৪ জুন ২০১৮

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ, এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে সাহায্য করা, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই সংস্করণে দেয়া তথ্যের মধ্যে আছে কক্সবাজারের স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির প্রতিবেদনে যে মূল বিষয়গুলি উঠে এসেছে; সেই সাথে সেই সমস্ত তথ্য যা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের সাথে কথাবার্তা বলে, জনগোষ্ঠীর মধ্যে দলগত আলোচনা করে এবং বাংলাদেশ বেতার ও রেডিও নাফে ইউনিসেফের সহায়তায় আয়োজিত লাইভ রেডিও অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের ফোন করে জানানো মতামত থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই কাজটি IOM, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং এটির অর্থ সংস্থান করছে ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

# ১,২,৩ এর মতো সহজ নয় বিষয়টা...

## রোহিঙ্গা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক সংখ্যা পদ্ধতি

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে কথাবার্তা বলার সময় সংখ্যা ভুল বোঝাবুঝির একটা বড় কারণ হতে পারে। যদিও রোহিঙ্গা ভাষায় সংখ্যাগুলোর নাম শুনতে চাটগাঁইয়া বা বাংলা ভাষার মতোই মনে হয় কিন্তু তাদের গণনার পদ্ধতি অনেকটাই আলাদা। যেখানে অধিকাংশ ভাষাতেই সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হল ১০ (দশমিক পদ্ধতি), সেখানে রোহিঙ্গারা তার বদলে ১০ (দশমিক) এবং ২০ (ভিজেসিমাল) এই দুটির মিলিত ভিত্তিতে একটি জটিল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে।

### গোলমেলে লাগছে? আচ্ছা, আরেকটু বুঝিয়ে বলা যাক

বাংলায় 'ছয়টা দশ' বোঝানোর জন্য শব্দটি হলো ষাট। ৬১ থেকে ৬৯ পর্যন্ত সংখ্যা বোঝাতে, ষাটের সাথে আপনি একটি করে সংখ্যা জুড়ে দেন। এইভাবে যেতে যেতে যখন আপনাকে ষাটের সাথে দশ যোগ করতে হয়, আপনি সত্তরে (সাতটি দশ) চলে যান। আর এই একই ধারায় আমাদের সংখ্যা গোনা এগোতে থাকে।

বাংলা এবং চাটগাঁইয়াসহ বেশিরভাগ ইন্দো-আর্য ভাষায় এই একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যদিও এই ভাষাগুলোতে ০ থেকে ১০০ অবধি প্রত্যেকটি সংখ্যা শুনতে আলাদা আলাদা এবং অনন্য মনে হয় কিন্তু আসলে সংখ্যাগুলো ১০ সংখ্যাটির ভিত্তিতে উপসর্গ এবং প্রত্যয়ের একটি নিয়ম অনুসরণ করে। ৬৮-কে বাংলা ভাষায় আটষট্টি এবং ৭৮-কে বাংলা ভাষায় আটাত্তর বলা হয়। আট- উপসর্গটি আট সংখ্যাকে বোঝায়, এবং প্রত্যয় –ষট্টি এবং –আত্তর যথাক্রমে ষাট এবং সত্তর বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু রোহিঙ্গা ভাষায়, ২০-ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি থাকার কারণে গণনা করার পদ্ধতি আরও জটিল। ১৯ পর্যন্ত, রোহিঙ্গা মানুষজন বাংলা বা চাটগাঁইয়া ভাষার মতই সংখ্যা গণনা করেন যেমন নিচের টেবিলে দেখানো হয়েছে। তবে, ২০ থেকে তারা ২০-ভিত্তিক গোণার পদ্ধতি ব্যবহার করেন। উদাহরণস্বরূপ, ২৫ সংখ্যাটিকে তারা বলে এক-কুড়ি-ফাস, বা বাংলাতে বললে, 'এক কুড়ি আর পাঁচ'। ৬৮ সংখ্যাটি হলো তিন কুড়ি আষ্ট, বা 'তিন কুড়ি আর আট'। ৮০ হলো সাইর-কুড়ি, বা 'চার কুড়ি'।

এটা অদ্ভুত মনে হলেও রোহিঙ্গাই একমাত্র ভাষা নয় যাতে একই সাথে দশমিক-কুড়ি ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ইতিহাস জুড়ে এমন বহু নজির আছে যেখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সংখ্যার ভিত্তিতে তাদের সংখ্যা পদ্ধতি তৈরি করেছে। যারা ফরাসি ভাষার ক্লাস নিয়েছেন তারা সবাই জানেন যে ৯৯ (কাত্রে-ভিং-দিজ-নাফ) বলা কতটা কঠিন যাকে বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'চার-কুড়ি-দশ-নয়'। দশমিক পদ্ধতি গণনার একমাত্র উপায় নয় (এবং কখনই ছিল না)।

তবে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিবন্ধিত শরণার্থী এবং নবাগতদের অনেকের মধ্যেই বর্তমানে বাংলার দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষজন কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করবেন তা শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে লিঙ্গ ও বয়সের কারণে শিক্ষাগত যোগ্যতায় লক্ষণীয় তারতম্য থাকে। পুরুষরা, যারা প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন বা কোনও ব্যবসায় যুক্ত আছেন তারা সাধারণত দশমিক পদ্ধতিই ব্যবহার করেন। উপরে যে মিশ্র সংখ্যা পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে তা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর স্বল্প-শিক্ষিত গোষ্ঠীর মানুষজন যেমন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা এখনো প্রায়ই ব্যবহার করেন।

## কিন্তু সংখ্যা নিয়ে জটিলতা এখানেই শেষ হয় না...

যদিও রোহিঙ্গা মানুষজন ধীরে ধীরে বাংলা ভাষার সংখ্যা পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন কিন্তু বাংলা, চাটগাঁইয়া, এবং রোহিঙ্গা ভাষায় সংখ্যাগুলোর নামের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন সাধারণ বাংলা ভাষায় ২০-কে সাধারণত বিশ বলা হয় কিন্তু রোহিঙ্গাতে একে কুড়ি বলা হয়।

সেই সাথে সংখ্যাগুলোর জন্য যে প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সেগুলোও এই ভাষাগুলোতে আলাদা হওয়ায় ব্যাপারটা আরও বেশি জটিল হয়ে উঠেছে। ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় সংখ্যাগুলি বোঝানোর জন্য আলাদা আলাদা প্রতীক ব্যবহার করা হয়। যে সমস্ত রোহিঙ্গা মানুষজন সদ্য এসেছেন, বিশেষত যারা খুবই স্বল্প শিক্ষিত বা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসেছেন তারা বাংলা প্রতীকগুলির সাথে পরিচিত নন। এই কারণে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে, যেহেতু কিছু বাংলা সংখ্যার প্রতীক ইংরেজি সংখ্যার প্রতীকগুলোর মতো দেখতে হলেও আসলে সেগুলো একেবারেই অন্য সংখ্যা (নিচের চার্টে এই পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে)। এইবার এই জটিল বিষয়টিতে বর্মী ভাষার সংখ্যা যোগ করা যাক, যে ভাষায় সংখ্যাগুলোর জন্য নিজস্ব প্রতীক (সেই সাথে সংখ্যার নামও) রয়েছে। যে সমস্ত রোহিঙ্গারা মায়ানমারে সরকারি স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন তারা বর্মী সংখ্যাগুলির সাথে পরিচিত কারণ সেই সংখ্যাগুলি প্রায়ই সরকারি কাগজপত্রে এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশিরভাগ রোহিঙ্গা ভাষাভাষী মানুষজন ইংরেজি সংখ্যার প্রতীকগুলির সাথেই পরিচিত এবং দশমিক-২০ ভিত্তিক মিশ্র সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করাই পছন্দ করেন।

## ইংরেজি, বাংলা, চাটগাঁইয়া, রোহিঙ্গা, এবং বর্মী ভাষায় সংখ্যাগুলি:

| ইংরেজি | | বাংলা | | চাটগাঁইয়া* | | রোহিঙ্গা** | বর্মী ভাষা | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zero | ০ | শূন্য | ০ | শূন্য | সিফির | ၀ | থানিয়া |
| 1 | One | ১ | এক | ১ | এক | এক | ၁ | টিট |
| 2 | Two | ২ | দুই | ২ | দুই | দুই | ၂ | নি |
| 3 | Three | ৩ | তিন | ৩ | তিন | তিন | ၃ | তোন |
| 4 | Four | ৪ | চার | ৪ | সাইর | সাইর | ၄ | লে |
| 5 | Five | ৫ | পাঁচ | ৫ | ফানস | ফানস | ၅ | ঙা |
| 6 | Six | ৬ | ছয় | ৬ | সো | সো | ၆ | চাউত |
| 7 | Seven | ৭ | সাত | ৭ | সাত | হানত | ၇ | খোন-নি |
| 8 | Eight | ৮ | আট | ৮ | আষ্টো | আ-আষ্টো | ၈ | শি |
| 9 | Nine | ৯ | নয় | ৯ | ন | ন | ၉ | কো |
| 10 | Ten | ১০ | দশ | ১০ | দশ | দশ | ၁၀ | তা-সে |

** চাটগাঁইয়ায় বাংলা সংখ্যা ব্যবহার করা হয়*
*** রোহিঙ্গায় সংখ্যার কোনও লিখিত রূপ নেই*

# রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু আশংকা রয়েছে; কিন্তু সেগুলো কিভাবে জানাবেন সে বিষয়ে তারা বিশেষ কিছুই জানেন না

বহু প্রতিবেদনে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় সম্পর্কে আশ্রয়দাতা বাংলাদেশী জনমানুষের ধ্যানধারণা তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু উভয় পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গল্পটা জানার জন্য স্থানীয় বাংলাদেশী মানুষজনের সম্পর্কে রোহিঙ্গাদের ধ্যানধারণা কি তা জানাও জরুরি।

২০১৭ সালের অগাস্ট মাস থেকে এখন অবধি যে সমস্ত রোহিঙ্গারা এসেছেন এবং এদের আসার বহুকাল আগে যে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে এসেছিলেন তাদের নিয়ে একটি গুণগত সমীক্ষা করা হয়েছিল। এতে দেখা গিয়েছিল যে যারা সদ্য এসেছেন তারা নিজেদের আশংকাগুলি বহিরাগতদের জানানোর ক্ষেত্রে সন্দিহান, অথচ যারা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে রয়েছেন তারা নিজেদের কিছু দুশ্চিন্তা জানাতে স্বচ্ছন্দ, যদিও সবকিছু নয়। দুটি দল থেকেই অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে তাদের আশংকা এবং অনুভূতিগুলি জানানোর জন্য কোনও বিশ্বস্ত জায়গা নেই।

সমীক্ষায় অংশ নেয়া রোহিঙ্গা অংশগ্রহণকারীরা খাবার এবং আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করার জন্য আশ্রয়দাতা বাংলাদেশী সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দিয়েছেন কিন্তু তারা অনেকগুলি সমস্যাও তুলে ধরেছেন। কিছু মানুষ অভিযোগ করেছেন যে স্থানীয় মানুষরা আশ্রয় দেয়ার বদলে তাদের থেকে ভাড়ার টাকা নেন।

লেদা ক্যাম্পের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ - বিশেষত যারা ১৯৯৪ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে এসেছেন - দাবি করেছেন যে তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাকাতি বেড়ে গেছে। তাদের বিশ্বাস যে তারা জানেন স্থানীয় বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের কারা এইসব ডাকাতির জন্য দায়ী, কিন্তু তারা মনে করেন যে তাদের পক্ষে কোনও অভিযোগ দায়ের করা সম্ভব নয় কারণ তারা নিজেদের আইনি অধিকার সম্পর্কে জানেন না। তারা আরও জানিয়েছেন যে তাদের বিশ্বাস কিছু অপেক্ষাকৃত বড়লোক রোহিঙ্গা পরিবারের সদস্যদের স্থানীয় মানুষজন অপহরণ করছেন যাতে প্রচুর টাকা দাবী করতে পারেন। সেই কারণে রোহিঙ্গা পুরুষ ও বয়স্ক মানুষরা সারারাত ক্যাম্পে পাহারা দেন।

> মাস খানেক আগে একটা বাচ্চাকে এখানকার একটা লোক চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল আর ফোন করে তার বাবা-মায়ের কাছে অনেক টাকা চেয়েছিল।"
>
> – রোহিঙ্গা মহিলা, ৫০, লেদা ক্যাম্প

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের এই বিশ্বাসের কথাও জানিয়েছেন যে স্থানীয় কিছু মানুষ তাদের পরিচয় বদলে, নিকাবে মুখ ঢেকে ত্রাণের জিনিস নেওয়ার জন্য রোহিঙ্গাদের সাথে লাইনে দাঁড়ান। স্থানীয় বাংলাদেশী মানুষজন যে আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন (স্থানীয় মানুষরা এর আগে সম্পত্তি বা জমি হারানোর কারণে আর্থিক সমস্যার কথা জানিয়েছেন) সেটা যদিও এর কারণ হতে পারে কিন্তু সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা এটাও বলেছেন যে স্থানীয় বাংলাদেশী মানুষজনদের ত্রাণসামগ্রী নেওয়ার চেষ্টা করার কারণে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে।

> আমরা সকলে, পুরনো এবং নতুন রোহিঙ্গা মানুষেরা একই লাইন থেকে আমাদের ত্রাণের জিনিস নিই। ২-৩ দিন আগে, এখানকার বাংলাদেশী একটি মেয়ে ত্রাণের জিনিস নিতে আসে আর একজন রোহিঙ্গা মেয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ে। আর ত্রাণের লাইনে ধাক্কাধাক্কি তো হতেই থাকে। কিন্তু, ওই বাঙালি মেয়েটাকে একটা রোহিঙ্গা মেয়ে যেই ঠ্যালা দিয়েছে ওমনি ওই বাঙালি মেয়েটার পরিবারের লোকেরা রোহিঙ্গা মেয়েটাকে প্রচণ্ড মারধর করতে শুরু করে।"
>
> – রোহিঙ্গা মহিলা, ৪৫, লেদা পুরানো ক্যাম্প

ক্যাম্পে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য কিছু রোহিঙ্গা মানুষ সেনাবাহিনীর প্রশংসা করেছেন।

> যদি সেনা বাহিনী (আর্মি) ক্যাম্পে না থাকত তাহলে আমরা ক্যাম্পে থাকতে পারতাম না"
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ২৪, শামলাপুর

উনচিপ্রাং ক্যাম্পে রোহিঙ্গা ও স্থানীয় বাংলাদেশী মানুষেরা পাশাপাশি বসবাস করেন। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে কিভাবে, যখন এন.জি.ও-র লোকেরা ক্যাম্পে ল্যাট্রিন তৈরি করতে এসেছিলেন তখন স্থানীয় সম্প্রদায়ের কিছু মানুষজন তাদের সেটা করতে বাধা দিয়েছিলেন কারণ তাদের বাড়ির পাশে ল্যাট্রিন তৈরি করা হলে দুর্গন্ধ আসবে। এছাড়াও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষজন জানিয়েছেন যে স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা রোহিঙ্গাদের সাথে একই পানির উৎস থেকে পানি নেওয়া পছন্দ করেন না।

সমীক্ষায় রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষরা অন্যান্য যে আশংকাগুলি জানিয়েছেন:

- আয়ের বাঁধাধরা সুযোগ নেই
- বাচ্চাদের পড়াশুনার যথেষ্ট সুযোগসুবিধার অভাব
- চলাফেরা করতে বাধা (ক্যাম্পের বাইরে যাওয়া যায় না)
- ক্যাম্পের সীমানার ভেতরে জনসংখ্যা বাড়ছে, সেই কারণে লোকের থাকার জায়গা কমছে
- পুরুষদের বহু বিবাহ আটকানোর জন্য আইন বলবত না করা

কুতুপালং, উনচিপ্রাং, শামলাপুর এবং লেদা ক্যাম্প থেকে ২০১৮ সালের ৮ই থেকে ১৫ই মে-এর মধ্যে গুণগত পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মোট ১৬টি ফোকাস দলে আলোচনা করা হয়েছিল, যাতে ৮০ জন অংশ নিয়েছিলেন। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫০% মহিলা ছিলেন এবং ১৮ থেকে ৪০+ বছর বয়সীদের মধ্যে থেকে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় ২৫% ২০১৭ সালের অগাস্ট মাসের আগে বাংলাদেশে এসেছিলেন; বাকি ৭৫% সম্প্রতি আগত রোহিঙ্গা শরণার্থী।

# রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মতামত - প্রত্যাবাসন, স্বাস্থ্য, রমজান, মাঝি এবং চরম আবহাওয়া

এই বিশ্লেষণটি ২৭শে মার্চ থেকে ২৪শে এপ্রিল, ২০১৮-এর মধ্যে ব্র্যাকের ৮০০ জন স্বেচ্ছাসেবক এবং ২৭শে মার্চ থেকে ২০শে মে, ২০১৮-এর মধ্যে ইন্টারনিউজের ১৩ জন জনগোষ্ঠীর সংবাদদাতা এবং একজন ফিডব্যাক ম্যানেজারের দৈনিক ভিত্তিতে সংগ্রহ করা মতামতের ভিত্তিতে করা হয়েছে। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের আশংকা ও প্রশ্নগুলি তুলে ধরার জন্য মোট ১৭৯২টি কথোপকথন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইন্টারনিউজের সংগ্রহ করা মতামতগুলি রোহিঙ্গা, বর্মী ভাষা এবং চাটগাঁইয়া ভাষায় সংগ্রহ করা হয়েছে। ব্র্যাকের তথ্যগুলি কয়েকটি ইংরেজি বিবরণসহ প্রধানত বাংলায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

**ইন্টারনিউজ**

| মোট মতামত | পুরুষ | মহিলা |
|---|---|---|
| ৪৪৬ | ২২৫ | ২২১ |

**ব্র্যাক**

| মোট মতামত | পুরুষ | মহিলা |
|---|---|---|
| ১৩৪৬ | ৩০৯ | ১০৩৭ |

## প্রত্যাবাসন

> আমরা কবে আমাদের নিজেদের দেশে ফিরে যাব আর আমাদের আইনি অধিকার ফিরে পাব?"
>
> – পুরুষ, ৩১, কুতুপালং এক্সটেনশন

> আমি ৩৫ বছর ধরে বাংলাদেশে বসবাস করছি। আমার বাংলাদেশের এন.আই.ডি কার্ড আছে। আমাকে মায়ানমারে ফেরত পাঠানো হলে আমি কি করব?"
>
> – মহিলা, ৪০, কুতুপালং এমএস

> মায়ানমারে অনেক রোহিঙ্গা খুন হয়েছে, কিন্তু এখনও তার সুরাহা করা হয়নি কেন? যদি এই সমস্যার তাড়াতাড়ি সমাধান করা হয় আর ওরা আমাদেরকে আমাদের নিজের জায়গাতে থাকতে দেয়, তাহলে ভালো হবে। কেবলমাত্র রেশনে খাবার দিয়ে আমাদের অবস্থার কোনও উন্নতি হবে না।"
>
> – পুরুষ, ২১, কুতুপালং এমএস

> আমাদের বার্মা নিয়ে গেলে আমরা কি করে খাবো ওখানে? ওরা আমাদের বার্মায় ফেরত নিয়ে গেলে, আমরা ওখানে খেয়ে-পরে থাকার জন্য কি করব?"
>
> – মহিলা, ১৯, নয়াপাড়া আর.সি

প্রত্যাবাসনের উপর মতামত তিনটি মূল বিষয় ঘিরে ছিল: সেইসব মানুষ যারা মায়ানমারে ফিরতে উন্মুখ, সেইসব মানুষ যারা এই বিষয়ে কোনও পছন্দ-অপছন্দ জানান নি কিন্তু প্রত্যাবাসন সম্পর্কে তাদের প্রশ্ন আছে, এবং সেই সব মানুষ যাদের ফেরত পাঠানো নিয়ে ভীতি রয়েছে। এই প্রধান দলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন এবং আশংকা রয়েছে, যেগুলির মধ্যে কখনও কখনও ভীষণ তফাত দেখা যায়।

যারা মতামত দিয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই মায়ানমারে ফেরার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তবে ফিরতে চাওয়ার কারণগুলো ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা। কিছু মানুষের মতে বাংলাদেশে তাদের জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন সংস্থা থেকে যে সহায়তা এবং ত্রাণসাহায্য দেওয়া হচ্ছে সেটা কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। ফেরার ইচ্ছের অন্যান্য কারণগুলোর সাথে জড়িত রয়েছে মায়ানমারকে 'বাড়ি' হিসেবে মনে করা।

যারা ফেরত যেতে ইচ্ছুক তাদের মধ্যে আরেকটি আলোচ্য বিষয় হল মায়ানমারের নাগরিক হিসেবে আইনি মর্যাদা পাওয়ার ইচ্ছা। এই সম্প্রদায়ের মানুষজন প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া এবং তাদেরকে মায়ানমারে আইনত এবং নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর নেয়া প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য চান।

সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ যেমন প্রত্যাবাসন সম্পর্কে ইতিবাচক অথবা নিরপেক্ষ মতামত জানিয়েছেন, একইসাথে অনেকের মতামতে মায়ানমারে ফেরত যাওয়া নিয়ে অনিচ্ছা এবং আশংকা প্রতিফলিত হয়েছে। এই দলের অনেকে মায়ানমারে বসবাসের অনিশ্চিত পরিস্থিতি, হিংসার পুনরাবৃত্তি, আর্থিক সংস্থানের অভাব এবং অরক্ষিত আইনি ব্যবস্থা যা তাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হবে তা নিয়ে ভীতি প্রকাশ করেছেন।

এছাড়াও, রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সেই সমস্ত মানুষজন যারা বাংলাদেশে বহু বছর ধরে রয়েছেন এবং বাংলাদেশের জাতীয় শনাক্তকরণ কার্ড পেয়েছেন তারা বাংলাদেশের নাকি মায়ানমারের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন সে বিষয়ে আশংকা প্রকাশ করেছেন।

সংক্ষেপে, রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যাবাসন একটি প্রধান আলোচনার বিষয় যে সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন, আশংকা রয়েছে এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য প্রচুর অনুরোধ করা হয়েছে।

## রমজান

> আমাদের ইফতারি [রমজান চলাকালীন সূর্যাস্তের পরে রোজা ভাঙার জন্য খাবার]-নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। আমাদের কাছে ইফতারি কেনার টাকা নেই আর সরকার [বাংলাদেশের] অনুমতি না দেওয়ায় আমরা কাজের জন্য দূরে কোথাও যেতেও পারছি না। এখানে কারোরই ভালোভাবে ইফতারি করার সঙ্গতি নেই। যদি কোনও এনজিও বা অন্য কেউ এখানে কিছু দিতে আসত, ভালো হতো।"
>
> – মহিলা, ৩৫, ক্যাম্প ১ই

> আমাদের ব্লকে একটাও টিউবওয়েল নেই তাই ভীষণ সমস্যা হচ্ছে। রমজানের সময় আমাদের বেশি পানি লাগে কারণ আমাদের নামাজ পড়া ও রান্না করার জন্য দিনে পাঁচ বার উজু করতে হয়। পানি আনতে আমাদের অনেক দূরে যেতে হয়, আমরা কি যে করব জানি না!"
>
> – পুরুষ, ৫৬, ক্যাম্প ১ডব্লিউ

> যথেষ্ট জ্বালানী কাঠ [রান্নার জ্বালানী] না থাকার কারণে আমাদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে আমাদের এক মাসের মতো জ্বালানী দিচ্ছে, কিন্তু তা এক সপ্তাহের আগেই শেষ হয়ে যায়। রমজান শুরু হয়ে গেছে, আমরা জঙ্গলেও যেতে পারছি না [জ্বালানী কাঠ আনার জন্য]। যদি আমরা জঙ্গলে যেতে পারতাম, আপনাদের আমাদের রান্নার জন্য জ্বালানী দিতে হতো না।"
>
> – পুরুষ, ২৫, ক্যাম্প ১ডব্লিউ

রমজান ঘিরে জনগোষ্ঠীর মানুষজন অনেক অনুরোধ ও আশংকা জানিয়েছেন যেমন রান্নার জন্য আরও জ্বালানী কাঠ দেওয়া, আরও বেশি পরিমাণে খাওয়ার পানি এবং রাত্রে মানুষজন যখন রান্না করেন, উজু এবং নামাজ পড়তে যান সেই সময়ে ক্যাম্পের মধ্যে নিরাপদে চলাচলের জন্য রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা। সেই সাথে, সম্প্রদায়ের কিছু মানুষজন জানিয়েছেন যে ত্রাণ সংস্থাগুলোর থেকে তারা যে খাবার পাচ্ছেন তা রমজানের জন্য উপযুক্ত নয়। এর পরিবর্তে মানুষজন বলেছেন যে তাদের ছোলা দেওয়া হলে সুবিধা হবে কারণ পুরো দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে রমজান চলাকালীন এটাই অন্যতম প্রধান খাবার। রমজানের ধর্মীয় আচার হিসেবে উজু করার জন্য পানি এবং গোসলের জায়গার অভাব (বিশেষ করে কমবয়সী মেয়েদের) নিয়েও আশংকা রয়েছে।

## চরম আবহাওয়া

> বাংলাদেশ থেকে মায়ানমারে আসার সময় আমরা যে কষ্ট ভোগ করেছি, তা ভোলার নয়। আমাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য আপনাদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ঝড় এলে কি আমরা আবার ভুগব?"
>
> – মহিলা, ২৬, কুতুপালং এমএস এক্সটেনশন

> আমরা বর্ষাকালে কিভাবে এই বাড়ি গুলোতে বসবাস করব? পাহাড়ের মাটি পড়ে তো মরে যাব! বর্ষাকালে আমরা কিভাবে এই ধরনের বাড়িতে থাকব? পাহাড়ে ধ্বস নামলে তো আমরা মারা যাব।"
>
> – নারী, ৪০, ময়নারঘোনা

> আমাদের চুলা আর কাঠ ভিজে গেলে সেগুলো তক্ষুনি কোথা থেকে পাবো?"
>
> – পুরুষ, ৩৬, কুতুপালং এমএস এক্সটেনশন

মার্চের শুরু থেকে চরম আবহাওয়া সম্পর্কে রোহিঙ্গারা মতামত দিয়ে এসেছেন এবং এই সমস্যাগুলো এপ্রিল এবং মে মাসের তথ্যেও উঠে এসেছে। মতামতের মধ্যে রয়েছে আবহাওয়াজনিত দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধ্বস, এবং তুফানের জন্য কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে সে সম্পর্কে আশংকা। এখনও কিছু মানুষজন ঘূর্ণিঝড়ের জন্য আশ্রয় (সাইক্লোন শেল্টার) আছে কিনা এবং তাদের ঘর খালি করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা সেই সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। কিছু মানুষ জানিয়েছেন যে তাদের ঘরকে কিভাবে আরও মজবুত করতে হবে সে সম্পর্কে তাদেরকে জানানো হয়েছে। কিন্তু জনগোষ্ঠীর মানুষজন এটাও জানিয়েছেন যে তাদের পক্ষে চরম আবহাওয়ার জন্য পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নেয়া কঠিন কারণ তাদের মতে তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই; এবং তারা মনে করেন যে তারা যে ভয়াবহ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং এখনও প্রত্যেকটা দিন বেঁচে থাকার জন্য তাদের এত পরিশ্রম করতে হচ্ছে যে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবা তাদের জন্য দুষ্কর।

## মাঝি

> মাঝিরা ঠিকমত জিনিসপত্র দিচ্ছে না।অনেকদিন ধরে চাউল পাচ্ছিনা। মাঝিরা আমাদের ঠিকমতো জিনিস দিচ্ছে না। আমরা বহু দিন ধরে চাল পাচ্ছি না।"
>
> – মহিলা, ৩৫, থাইংখালি

> আমাদের মাঝি আমাদেরকে ঠিকমত টোকেন দেয় না। আমাদের মাঝি আমাদেরকে ঠিকমত টোকেন দেয় না"
>
> – মহিলা, ২৫, জামতলী

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ মাঝিদের থেকে পাওয়া পরিষেবা ও সহায়তা সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করেছেন এবং কিছু মাঝির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। মানুষজন মনে করছেন যে কয়েকজন মাঝি পুরো সম্প্রদায়ের কথা ভেবে কাজ না করে কেবলমাত্র সেই সমস্ত সমস্যার সমাধানে মন দিচ্ছেন যাতে তাদের নিজেদের বা তাদের পরিবারের সুবিধা হবে।

## পানির অভাব ও চর্মরোগ

> পানির অভাবে গোসল করতে না পেরে চর্ম রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। পানির অভাবে গোসল করতে পারছি না, তাই আমাদের চর্মরোগ হচ্ছে।"
>
> – মহিলা, ৩৫, উনচিপ্রাং

> অনিরাপদ পানি খেয়ে সবাই পেটের রোগে ভোগতেছি। অনিরাপদ পানি খেয়ে আমাদের পেটীর রোগ হচ্ছে।
>
> – মহিলা, ২০, উনচিপ্রাং

বিশ্লেষণ করা তথ্য থেকে জানা গেছে গত কয়েক মাস ধরে রোহিঙ্গা জনমানুষদের একটি প্রধান দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল খাওয়া এবং গোসলের জন্য নিরাপদ ও পরিষ্কার পানি পাওয়া এবং এখনো জনগোষ্ঠীর মানুষরা এই সমস্যা নিয়ে চিন্তায় আছেন। সম্প্রদায়ের অনেকেই প্রতিদিন গোসল করতে পারেন না ও নিজেদের পরিষ্কার করতে পারেন না বলে চর্ম রোগ হওয়ার আশংকা প্রকাশ করেছেন। সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এটাও জানিয়েছেন যে তারা অনিরাপদ পানি খাওয়ার পরে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। জনগোষ্ঠীর মানুষজন বারবার আরেকটি যে দুশ্চিন্তার কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো নলকূপগুলো। তাদের মনে হয় সেগুলি খুবই অগভীর এবং তাই সেগুলির পানি খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

# বেতার সংলাপ: মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে।

কক্সবাজার জেলায় প্রায় ৮০ হাজার জেলে বসবাস করেন, যাদের মধ্যে বেশির ভাগই মহেশখালি (৪০ হাজার) এবং টেকনাফে (২২ হাজার) থাকেন। জেলেদের মধ্যে বাড়তে থাকা অসন্তোষ বেতার সংলাপের সাম্প্রতিকতম পর্বে ধরা পড়েছে। এই পর্বটি ৭ই মে নাফ নদীর কাছে টেকনাফের হ্নীলা হাই স্কুলে রেকর্ড করা হয়েছিল। শ্রোতাদের মধ্যে যদিও বিভিন্ন পেশার মানুষ ছিলেন কিন্তু তাদের বেশিরভাগই জেলে অথবা মাছ-সংক্রান্ত ব্যবসায় জড়িত ছিলেন।

শ্রোতারা প্রধানত নাফ নদীতে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা যে আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। শুরুতে নদীতে মাছ ধরার উপর দুই মাসের জন্য নিষেধাজ্ঞা ছিল , আপাতভাবে সীমা পার করে লোকজনের আসাযাওয়া এবং ক্রমবর্ধমান মাদক পাচার বন্ধ করার জন্য । কিন্তু এখনও এই নিষেধাজ্ঞা বলবত রয়েছে, এবং বেতার সংলাপে শ্রোতাদের প্রশ্নে এটাই মূল দুশ্চিন্তা তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

বেতার সংলাপের শ্রোতাদের মতে হ্নীলা সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষই জেলে। তাদের জন্য মাছ ধরাই টাকা রোজগারের একমাত্র উপায়। তারা বলছেন যে নাফ নদীতে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞার কারণে তাদের পক্ষে টাকা রোজগার করা ও পরিবার প্রতিপালন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে।

শ্রোতারা এই সমস্যাও জানিয়েছেন যে তারা নৌকা বা মাছ-ধরা জাল কেনার জন্য আগে যে ঋণ নিয়েছিলেন সেই টাকা শোধ করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে; এবং এ কারণে তারা তাদের বাচ্চাদের পড়াশুনার জন্য টাকা দিতে পারছেন না।

> আমার টাকা রোজগারের একমাত্র উপায় মাছ ধরা। কিন্তু রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের পর, আমি মাছ ধরতে যেতে পারছি না। আমার টাকা রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এইভাবে চলতে থাকলে, আমরা না খেতে পেয়ে মরবো ।"
>
> – পুরুষ, বয়স ৩৫, জেলে

> আমি একজন জেলে আর আমি মাছ ধরে টাকা রোজগার করি। বি.জি.বি [বর্ডার গার্ড] রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের পর নাফ নদীতে মাছ ধরা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা মাছ ধরতে পারছি না আর কোনও টাকাও রোজগার করতে পারছি না। যদি সরকার নাফ নদীতে আমাদের মাছ ধরার অনুমতি না দেয়, আমাদের জন্য বিকল্প কি?"
>
> – পুরুষ, বয়স ৫৮, জেলে

> রোহিঙ্গা সংকটের কারণে স্থানীয় জেলেরা এখন মাছ ধরতেও যেতে পারছেন না। তাদের মধ্যে অনেকে তাদের ঋণ শোধ করতে পারছেন না, তাদের বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে পারছেন না আর পরিবারের জন্য খাবার জোগাড় করাও কঠিন হয়ে উঠেছে। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য কি করা যায়?"
>
> – পুরুষ, বয়স ৩০, জেলে

> আমি বিভিন্ন এন.জি.ও/সংস্থা থেকে মাছ ধরার জাল কেনার জন্য ঋণ নিয়েছিলাম যাতে মাছ ধরতে পারি আর আমার ও আমার পরিবারের প্রতিপালনের জন্য টাকা রোজগার করতে পারি। কিন্তু রোহিঙ্গাদের আসার পরে মাছ ধরার জন্য আমাদের আর নদীতে যাওয়ার অনুমতি নেই। আমরা একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছি।"
>
> – পুরুষ, বয়স ৪৮, জেলে

# সময়ের সাথে সাথে কক্সবাজারের স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোতে রোহিঙ্গাদের কাজকর্ম নিয়ে সমালোচনা বাড়ছে

কক্সবাজারে প্রায় ১৯টি দৈনিক সংবাদপত্র রয়েছে, যার প্রায় প্রত্যেকটি রোহিঙ্গা সংকট সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করছে। এই সংবাদগুলো সময়ের সাথে সাথে কিভাবে বদলাচ্ছে সেই দিকে নজর দিলে আমরা স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকা এবং তারা পাঠকদের কি ধরনের বার্তা দিতে চায় সেই সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারি কারণ এগুলো জনমানুষের ধারনাকে প্রতিফলিত করার পাশাপাশি তাদের ধারনাকে প্রভাবিতও করে।

গত ২০১৭ সালের নভেম্বরে রোহিঙ্গা সংকট সংক্রান্ত সংবাদ খুব ঘন ঘন প্রকাশ করা হত এবং প্রত্যেকটি স্থানীয় সংবাদপত্র প্রত্যেকদিন এই নিয়ে চার থেকে পাঁচটি সংবাদ ছাপত। এই সংবাদগুলোর প্রধান বিষয় ছিল কত লোক সীমানা পেরিয়ে এল, কোন কোন জায়গা থেকে শরণার্থীরা ঢুকছে, কারা ক্যাম্প পরিদর্শনে গেছেন এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষদের কি পদ্ধতিতে নিবন্ধন করা হচ্ছে।

ক্রমশ এই বিষয়গুলো নিয়ে খবরের সংখ্যা কমতে থাকে কিন্তু তখনও নবাগত শরণার্থীদের প্রতি একটা সহানুভূতিশীল মনোভাব ছিল। ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত সংবাদগুলোতে মূলত রোহিঙ্গা সম্প্রদায় এবং ক্যাম্পের আশেপাশের এলাকায় থাকা মানুষজনের চাহিদা ও সমস্যাগুলো উঠে আসতে লাগল। সেই সময় খবরের একটা মূল বিষয় ছিল রান্নার জন্য জ্বালানী কাঠের চাহিদা এবং এর জন্য কিভাবে অসংখ্য গাছ কাটা চলছে। স্থানীয় বাজারে ত্রাণ সামগ্রী বিক্রি, দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া এবং রোগভোগ ছড়ানোর আশংকার মতো সমস্যাগুলোও নিয়মিতভাবে খবরের শিরোনামে থাকত।

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নাগাদ সংবাদপত্রগুলো রোহিঙ্গাদের করা অপরাধ সম্পর্কে আরও বেশি সংখ্যক খবর ছাপতে শুরু করে। কিছু সংবাদপত্র খবর প্রকাশ করে যে ক্যাম্পের রোহিঙ্গা পুরুষ ও মহিলারা অবৈধ (বিবাহ-বহির্ভূত) শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছেন এবং কিছু মহিলা এই কারণে গর্ভবতীও হয়ে পড়ছেন। কিছু প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে রোহিঙ্গারা বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্ম যেমন মাদক পাচার, অপহরণ, ডাকাতি এবং মানুষ পাচারে লিপ্ত হচ্ছে। সেই সময় একটি খবর শিরোনামে ছিল যাতে বলা হয়েছিল যে নয়টি এন.জি.ও-র (জাতীয় এবং স্থানীয় উভয়) বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা প্রত্যাবাসন আটকানোর জন্য রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে লড়াই করতে উৎসাহিত করছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে, স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো স্থানীয় বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং এন.জি.ও-গুলির দুর্নীতির খবর ছাপে। সেগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে রোহিঙ্গারা ক্যাম্পের আশেপাশের এলাকায় কাজ করা শুরু করেছে, যার ফলে স্থানীয় বাংলাদেশীরা কাজ পাচ্ছে না। একইসাথে, অনেক খবরে এটাও বলা হয়েছিল যে ক্যাম্পে নিরাপত্তার অভাব থাকায় প্রচুর সংখ্যায় রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে চলে যাচ্ছে।

মার্চ থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সংবাদপত্রের সাম্প্রতিকতম বিশ্লেষণে দেখা গেছে রোহিঙ্গাদের নিয়ে খবরের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে এবং প্রত্যাবাসনের বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।। প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদ মাধ্যমে যে সমস্যাগুলো নিয়ে একাধিক সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো হল:

- মায়ানমার সরকার কিভাবে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াতে দেরি করছে;
- রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে ইউ.এন, ও.আই.সি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের পরিদর্শনের বিবরণ;
- প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে রোহিঙ্গারা কি মনে করছেন;
- আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির রাখাইনের পরিবেশ সম্পর্কে কি ধারণা এবং সেটা প্রত্যাবাসনের জন্য নিরাপদ কিনা।

সাম্প্রতিক সংবাদগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে অপরাধ সংক্রান্ত যেকোনো খবরগুলোর শিরোনামে বিশেষভাবে রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। যেমন বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রে 'রোহিঙ্গা ডাকাত অস্ত্রশস্ত্র ও গুলি সহ গ্রেপ্তার' শিরোনামটি ছাপা হয়েছিল ; আরেকটি শিরোনাম ছিল 'তিনজন রোহিঙ্গা ইয়াবা সহ ধৃত' (৪ই মে)। ইয়াবা পাচারে রোহিঙ্গাদের জড়িত থাকার কারণে আশ্রয়দাতা বাংলাদেশী মানুষজনের উদ্বেগও স্থানীয় সংবাদপত্রে তুলে ধরা হয়েছে। এই সময়ে আসন্ন বর্ষাকালে ভূমিধ্বস ও বন্যার আশংকাকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ক্যাম্পে পানির অভাবে রোহিঙ্গাদের দুর্দশার খবর প্রকাশ করা হয়েছে কারণ প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে নলকূপগুলোর মধ্যে ৭০ থেকে ৮৫ শতাংশ কাজ করছে না। কিছু সংবাদপত্রে মায়ানমারে ধর্ষিতা কিছু মহিলার গর্ভবতী হওয়া এবং তাদের আসন্ন প্রসব সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে এবং প্রতিবেদনে এই শিশুদের 'অবাঞ্ছিত সন্তান' নামকরণ করা হয়েছে।

## রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কক্সবাজারের স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোতে কভারেজে পরিবর্তন